গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা | ৯ - ১৫ মে ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

হোটেলে আগুন
সন্তানহারা মায়ের কাছে ক্ষমা চান শাসকরা

কলকাতার বড়বাজারের হোটেলের আগুনে যে মা তাঁর দুই সন্তানকে হারালেন, যে সব পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল, কলকাতা পুরসভার শাসক তথা রাজ্যের শাসন তখতে আসীন কর্তারা কি একবারও তাঁদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইবার কথা ভেবেছেন! এ দেশের শাসকদের স্বভাব জানলে এমন আশা স্বপ্নেও কেউ করবেন না। কিন্তু জনগণের পয়সায় আমিরি করা কাউন্সিলর, মেয়র, মন্ত্রীর দলের এতটুকু মানবিকতা অবশিষ্ট থাকলে তাঁরা তা করতেন। ফলে যথারীতি দুই শিশু সহ ১৪ জন মানুষের জীবন চলে যাওয়ার পরে তাঁদের কাছ থেকে সেই পুরনো দায় ঠেলাঠেলির খেলা ছাড়া আর কিছু দুর্গত পরিবারগুলির জুটলো না। আগুন লাগার কারণ যে সর্বোচ্চ লাভের নেশায় হোটেল মালিকের নিয়মের তোয়াক্কা না করা এবং পুরসভা, পুলিশ, দমকল এই তিন দপ্তরের নজরদারিতে চরম অনীহা— তা যে কোনও মানুষই বুঝবন। সে কারণেই সরকারি কর্তারা ব্যস্ত থেকেছেন হোটেল মালিকের নিয়ম না মানার দায় একে অন্যের ঘাড়ে ঠেলে নিজে হাত ধুয়ে ফেলতে। মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় ধর্মীয় কর্মসূচি সাঙ্গ করে পোড়া হোটেলের সামনে গিয়ে যখন কড়া হাতে সব দমন করার কথা বলে 'সব ঠিক হ্যায়' ধরনের বার্তা দিতে চেয়েছেন, তাতেও তাঁর দল পরিচালিত সরকারের গাফিলতি ঢাকার বদলে আরও স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্নটা এখানেই, জানা যাচ্ছে ওই হোটেলের দমকলের ছাড়পত্র শেষ হয়ে গেছে অন্তত তিন বছর আগেই। দমকলের ছাড় পত্র না থাকলে হোটেলের ট্রেড লাইসেন্স, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লাইসেন্স

ছয়ের পাতায় দেখুন

মে দিবসে দেশে দেশে তুমুল বিক্ষোভ
মুক্তি আকাঙ্ক্ষাই পথে নামিয়েছে শ্রমিকদের

১ মে। শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল গোটা বিশ্ব। দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণি এ দিন যে ভাবে সংগঠিত বিক্ষোভে পথে নেমেছেন, সাম্প্রতিক কালে তা নজিরবিহীন। উল্লেখযোগ্য হল, এ মিছিল বিশ্বজুড়ে কোনও সংগঠিত শক্তির ডাকে হয়নি। মালিক শ্রেণির শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ থেকেই কোথাও বামপন্থী দলের ডাকে, কোথাও শ্রমিক সংগঠনের ডাকে শ্রমিক শ্রেণি নিজস্ব উদ্যোগেই এ দিন পথে নেমেছে। সর্বত্রই বিশাল বিশাল জমায়েত হয়েছে শ্রমিকদের।

বিশ্বের সর্বত্র ছাঁটাই, বেকারি, অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাঁটাই, মানবাধিকার হরণ করে চলেছে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি। শ্রমিক-মেহনতি মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার আজ পদে পদে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধেই পথে নেমেছেন শ্রমিকরা, পুলিশের সাথে ব্যারিকেড ফাইট করেছে।

১ মে বার্লিনে শ্রমিকদের বিশাল মিছিল হয়। প্যারিসে গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং লড়াকু

আটের পাতায় দেখুন

আমেরিকার লস এঞ্জেলেসে বিশাল শ্রমিক বিক্ষোভ

রাজনীতি বুঝুন, সঠিক দল বিচার করুন আন্দোলনের গণকমিটি গড়ে তুলুন
২৪ এপ্রিল শহিদ মিনার ময়দানে কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

কমরেড সভাপতি, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

প্রখর রৌদ্রতাপ উপেক্ষা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এখানে আপনারা সমবেত হয়েছেন দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এবং সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে দলের বক্তব্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার জন্য। কাশ্মীরে অত্যন্ত মর্মান্তিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে এইমাত্র সভায় প্রস্তাব পেশ করা হল।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার দায় কেন্দ্রীয় সরকার এড়াতে পারে না

যে জঙ্গিগোষ্ঠী এই হত্যাকাণ্ড করেছে তারা দাবি করেছে কাশ্মীরের স্বার্থে তারা এটা করেছে। বাস্তবে তারা কাশ্মীরের এবং দেশের চরম ক্ষতি করেছে। শুধু কিছু নিরীহ প্রাণহানি ঘটেছে, কিছু মানুষ আহত হয়েছেন তাই নয়, এর ফলে কাশ্মীরবাসীর জীবিকা যে পর্যটন শিল্পের উপর দাঁড়িয়ে— দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভ্রমণ, কাশ্মীরের পশম শিল্প, বস্ত্র শিল্প, অন্যান্য শিল্পদ্রব্য ও ফলের কেনাবেচা— এর সবটাই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। আর একটা দিক দিয়েও কাশ্মীর ক্ষতিগ্রস্ত হল।

এই ঘটনার পর কাশ্মীরে সামরিক তৎপরতা আরও অনেক বাড়বে। জঙ্গি দমনের নামে ইতিপূর্বে যেমন ঘটেছে এ বারও তেমনই সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার ঘটবে। এমনিতেই কাশ্মীরে নিরাপত্তা রক্ষার নামে বিপুল পরিমাণ সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এত সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগের উপস্থিতি সত্ত্বেও এই সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটতে পারল কী করে? এর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করতে পারে না। এই হামলার দ্বারা সন্ত্রাসবাদীরা সাহায্য করল ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি এবং আরএসএসকে। বিজেপি-আরএসএস অনেক দিন ধরেই দেশে প্রবল ভাবে মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলছে হীন ভোট-রাজনীতির স্বার্থে, এ বার জঙ্গিদের মুসলিম হিসাবে চিহ্নিত করে এই ঘটনাকে তারা সেই কাজে আরও বেশি করে ব্যবহার করবে। এমনিতেই কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রেরই সম্পর্ক তিক্ত। এই ঘটনায় এটা আরও বাড়বে।

এটাও সংবাদে এসেছে যে, দুর্গতদের বাঁচাবার জন্য জঙ্গিদের অস্ত্র কেড়ে নিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন একজন মুসলিম যুবক। ঘটনার সাথে সাথে আহতদের বাঁচানোর জন্য যাঁরা ছুটে এসেছিলেন, তাঁরাও সবাই মুসলিম জনগণ। এই হত্যাকাণ্ডের মর্মান্তিকতায় কাশ্মীর উপত্যকা শোকে স্তব্ধ। প্রতিবাদে কাশ্মীর জুড়ে সর্বাত্মক বনধ পালিত হয়েছে। যাঁরা বনধ পালন করেছেন তাঁরা সকলেই মুসলিম। এই হত্যাকাণ্ডকে তাঁরা মানবতার উপর আক্রমণ হিসাবেই দেখেছেন। **এই সমাবেশ থেকে আমি দেশের মানুষের কাছে একটি আবেদন জানাব— বিজেপি-আরএসএস এই ঘটনাকে ভিত্তি করে দেশ জুড়ে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ জাগাবার চেষ্টা করবে, সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করবে— এদের সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন।**

ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি চলছে

গোটা দেশেই দীর্ঘদিন ধরে ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্স

দুয়ের পাতায় দেখুন

মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চলছে বিজেপি-তৃণমূলের

একের পাতার পর

নামে একটা পলিটিক্স চলছে। বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ছিল এর একটা পর্যায়। তারপর একের পর এক— কোন মসজিদের তলায় কী আছে তা খোঁজা চলছে। মসজিদ ভেঙে সেখানে শিবের মূর্তি, কৃষ্ণের মূর্তি আছে কি না খুঁজে বের করা, নানা শহরের নাম পরিবর্তন, সব শেষে এই ওয়াকফ সংশোধন আইন, যেটাকে কোনও গণতান্ত্রিক মানুষ সমর্থন করতে পারেন না— এই সব কিছুর লক্ষ্য হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক আরও শক্তিশালী করা। এই সব কিছুই বিজেপি-আরএসএস করেছে রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায়। অথচ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি হল, ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্র থাকবে নিরপেক্ষ। কিন্তু ভারতে কংগ্রেস শাসন থেকে শুরু করে বরাবর উল্টো জিনিসই ঘটেছে। এই জিনিস এই রাজ্যেও ঘটছে, যেটা দেখা গেল মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছি। পুলিশ সব কিছুই জানত। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পরিকল্পিত ভাবে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। এটা কি স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের সিদ্ধান্ত? রাজ্য সরকার কি এই ঘটনার দায়িত্ব এড়াতে পারে? এটা ঘটল কেন? নাকি রাজ্যের তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে আরও মজবুত করতেই এটা ঘটাল? অন্য দিকে তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককেও রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ফলে কে কত পুজো দিতে পারে তার কম্পিটিশন চলছে। বিজেপি যেমন উত্তরপ্রদেশে রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করছে, এ রাজ্যেও তৃণমূল দিঘাতে জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে। এক দিকে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা এবং অন্য দিকে রামনবমী পালনের প্রতিযোগিতা চলছে। বিজেপি রামনবমী করছে, একই সাথে তৃণমূলও রামনবমী করছে। রামচন্দ্র রামায়ণের একটা চরিত্র। যাঁরা রামায়ণ পড়েছেন এটা তাঁরা জানেন। কিন্তু রামচন্দ্রের পুজো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেনি। এখন রামচন্দ্রের পুজো, হনুমানের পুজো, একের পর এক নানা পুজো চলছে গোটা দেশে ও পশ্চিমবঙ্গে। কেবলই ধর্মকে উস্কানি দেওয়া, ধর্মকে ব্যবহার করা— ভারতে এই জিনিস এর আগে ছিল না। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে, যাঁরা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তাঁদের নিয়ে তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি যাঁরা ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরাও এ-সব জিনিস করেননি। আপনারা কখনও দেখেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পুজোর জন্য ছুটছেন, বিপিনচন্দ্র পাল ছুটছেন, লালা লাজপত রায় ছুটছেন? সুভাষচন্দ্রের তো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা কেউ এ সব করেছেন? এখন এক উন্মাদনা চলছে প্রবলভাবে এবং সবচেয়ে লক্ষণীয়, রাজনীতিকরাই এখন ধর্মপ্রচারক। আগে সন্ন্যাসীরা ধর্ম প্রচার করত। এখন তারা বেকার। সর্বশেষ ধর্মপ্রচারক হিসাবে যাঁকে হিন্দুমাত্রেই শ্রদ্ধা করেন, আমাদের সাথে দর্শনগত মতপার্থক্য থাকলেও আমরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করি— তিনি বিবেকানন্দ। এরপর ধর্মকে ভিত্তি করে আর কোনও বড় চরিত্র এ দেশে আসেনি।

ধর্মের নামে চলছে ভণ্ডামি

এখন দেশের প্রধানমন্ত্রীও ধর্মপ্রচারক। রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীরাও ধর্মপ্রচারক। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও ধর্মপ্রচারক। তাঁরাই এখন ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন। এঁরা কি যথার্থ ধর্মপ্রচারক? আপনারা কি মনে করেন প্রধানমন্ত্রী সত্যই নিষ্পাপ, চরিত্রে খাঁটি ধর্ম মেনে চলেন? ধর্মেও যেসব আদর্শের কথা রয়েছে সেগুলো তিনি মেনে চলেন, আপনারা কি এ কথা বিশ্বাস করেন? আপনারা কি মনে করেন, অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃতই ধর্মে বিশ্বাসী? এঁরা যে ভাবে সরকার চালাচ্ছেন, যে ভাবে দেশ চলছে, সবটাই ধর্মীয় শাসন? কোথাও অধর্ম নেই, কোথাও পাপ নেই, অত্যন্ত নিষ্পাপ চরিত্র এঁরা? এটা হচ্ছে চরম ভণ্ডামি, মানুষকে প্রতারণা করা। তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য— ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং এ জন্যই একের পর এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নানা ধর্মীয় মেলা, দুর্গা পুজোয় সরকারি তহবিল থেকে অনুদান দেওয়া চলছে। আগে পাড়ার ক্লাব চাঁদা তুলে পুজো করত, এখন সরকার টাকা দেয়। পাবলিক ফান্ডের কত বড় অপব্যবহার! এই যে সরকার প্রত্যেকটি ক্লাবকে টাকা দিচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ভোটের ইনভেস্টমেন্ট। কুম্ভমেলায় কত মানুষ মারা গেল তার হিসাব নেই। পোস্টমর্টেমও হয়নি। এই মেলাটাও ছিল একটা ইনভেস্টমেন্ট। সংবাদপত্রে যা খবর, মোদি যখন বিদায় নেবেন, তাঁর জায়গায় অমিত শাহ নাকি যোগী আদিত্যনাথ, কে বসবেন— তারই জন্যে যোগীর কৃতিত্ব জাহির করা। যাঁরা সৎ ভাবে ধর্ম মানেন তাঁরা কি এদের এই সব কাজকর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন? দেখা উচিত কি? এ সবই আসলে ধর্মের নামে ভণ্ডামি, প্রতারণা।

আমরা মার্ক্সবাদী। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। আমরা নিরীশ্বরবাদী হলেও অতীতে ধর্মের প্রগতিশীল ভূমিকাকে মানি। ধর্ম প্রচারকদের শ্রদ্ধা করি। আমাদের নেতারা এটাই শিখিয়ে গেছেন। মহান মার্ক্স ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন, ধর্মীয় দুঃখ গরিব মানুষের দুঃখেরই প্রকাশ। ধর্মীয় প্রতিবাদ, অত্যাচারের প্রতি মানুষের প্রতিবাদ। ধর্ম এনেছে হৃদয়হীন পৃথিবীতে হৃদয়বৃত্তি। ধর্ম এনেছে বিবেকহীন পৃথিবীতে বিবেক। এ সব মহান মার্ক্সের উক্তি। মহান এঙ্গেলস বলেছেন, ধর্মপ্রচারকরা সাম্য চেয়েছেন মৃত্যুর পরে স্বর্গে। আর আমরা বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে এই মর্ত্যের মাটিতে সেই সাম্য প্রতিষ্ঠা করছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ধর্ম সেই যুগে মানুষের মধ্যে এনেছে ন্যায়নীতিবোধ, কল্যাণবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, পাপ-পুণ্যবোধ। সেই যুগে সমাজের স্বার্থে তার প্রয়োজন ছিল। যদিও গীতা-মনুসংহিতা, বেদ, বাইবেল, কোরানে আজকের দিনের জনজীবনের কোনও সমস্যার কোনও উল্লেখ ও সমাধান নেই। কারণ সেই সময় এই সব সমস্যা দেখা যায়নি। সেই যুগে ধর্মপ্রচারকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আজকের দিনের কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মের, মন্দির-মসজিদ-গির্জার কোনও ভূমিকা নেই। তারা শোষক শ্রেণির আর্থিক সাহায্যে চলছে ও তাদের পক্ষেই কাজ করছে। এই জন্যেই মার্ক্স বলেছিলেন, ধর্মকে শোষক শ্রেণি আফিংয়ের মতো ব্যবহার করছে শোষিত মানুষ যাতে দুঃসহ অত্যাচারিত জীবনকে কল্পিত ভগবানের বিধান হিসাবে মেনে নেয়। এই ভাবেই শোষক শ্রেণি শোষিত মানুষকে ধর্মীয় নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখে। সঙ্কট যত দুর্বিষহ হচ্ছে, প্রতিকারহীন বেদনায় ইহলোকে করুণা ও পরলোকে সুবিচারের প্রত্যাশায় হাজারে হাজারে মানুষ উন্মাদের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ছুটছে, শয়ে শয়ে পদপিষ্ট হচ্ছে। যত সঙ্কট বাড়বে, সঠিক জ্ঞান ও সমাধানের পথ না পেলে এই ধর্মান্ধতা আরও বাড়বে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে পুঁজিবাদই ধর্মকে ত্যাজ্য বলেছিল

ইতিহাসের একটা পর্যায়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদ যখন মাথা তুলছে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে, তখনকার চিন্তা ছিল, রাজা ভগবানের প্রতিনিধি, রাজার বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই ভগবানের বিরুদ্ধে যাওয়া। ফলে তখন এই পুঁজিপতিদের প্রয়োজন ছিল ধর্মকে আঘাত করার। তখন পুঁজিবাদের শৈশব-কৈশোরের যুগ, আজকের পুঁজিবাদ নয়। তখন পুঁজিবাদ সংগ্রামী, প্রগতিশীল, নতুন সভ্যতা গড়ে তুলছে, গণতন্ত্রের আহ্বান জানাচ্ছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবতাবাদী মূল্যবোধের স্লোগান তুলছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলছে। বলছে, সব কিছু প্রজারাই ঠিক করবে— এটাই প্রজাতন্ত্র। আগে রাজারা সিংহাসনে বসার আগে গীতা কোরান বাইবেল হাতে প্রতিজ্ঞা নিত। আর পুঁজিবাদ নিয়ে এল— ওই সব নয়, সংবিধান মানতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিরা পরিচালনা করবে প্রজাতন্ত্র। এই ভাবেই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি এসেছিল। সেই সময় যে বুর্জোয়া চিন্তানায়করা ছিলেন তাঁরা ধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে বুঝতে পারেননি, বরং ধর্মকে তাঁরা অবমাননা করেছিলেন। বেকন, স্পিনোজা, লক, হবস, কান্ট, ফুয়েরবাখ এইসব দার্শনিক চিন্তানায়করা সেই যুগে বলেছিলেন, ধর্ম হচ্ছে 'অ্যাবারেশন অফ হিস্ট্রি', ইতিহাসের একটা পরিত্যাজ্য অধ্যায়। কিন্তু মার্ক্স খুব সঠিকভাবে দেখিয়েছেন ধর্মের ভূমিকা কী ছিল।

আদিম যুগে মানুষ ঈশ্বর জানত না

কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, আদিম যুগে মানুষ ঈশ্বরচিন্তা করেনি। তারা প্রকৃতিকে মানত। জলকে পুজো করত, বায়ুকে, আগুনকে, গাছকে, পাহাড়কে পুজো করত। প্রকৃতিকে জয় করতে চেয়েই নানা রকমের মন্ত্রতন্ত্র তৈরি হয়েছিল আদিম যুগে। এ কথার স্বীকৃতি বিবেকানন্দের লাহোর বক্তৃতাতেও আছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রথম দিকে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে সত্যের সন্ধান করেছিল। প্রথম দিকে মানুষ বস্তুজগতের মধ্যেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছিল। আজও আদিবাসীদের মধ্যে— আন্দামানে যান, অস্ট্রেলিয়া-কানাডায় যান, পাবেন প্রকৃতি পূজা। এই কিছুদিন আগে বিজেপি আদিবাসীদের হিন্দু বলে দাবি করাতে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, আমরা ঈশ্বরের পূজা মানি না, আমরা প্রকৃতিকে পূজা করি। তা হলে ঈশ্বরচিন্তা কখন এল? এর বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি দেখিয়েছেন দাসপ্রথার যুগে দাসদের উপরে যখন নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে দাসপ্রভুরা, সেই সময় দাসদের কান্না— এটাই কি চলবে? দাসপ্রভুর উপরে কি আর কেউ নেই? সেই সময়কার এক দল চিন্তাবিদ এতে বিচলিত হয়ে চিন্তা করেছেন—সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত ঘটছে একটা নিয়মে, একটার পর একটা ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, দিনরাত্রি হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে— সবই তো একটা নিয়মে চলছে। বিশ্ব নিয়মে চলছে কী করে? তা হলে দাসপ্রভুদের নির্ধারিত নিয়মে যেমন সমাজ চলছে, তেমনই নিশ্চয় বিশ্বপ্রভু কেউ আছে। এখান থেকেই এল বিশ্বপ্রভুর চিন্তা, এখান থেকেই এল ধর্মীয় চিন্তা এবং বিশ্বপ্রভুর নির্ধারিত নিয়ম দাসপ্রভু ও দাস উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য— এই চিন্তা। এক এক দেশের সমস্যা অনুযায়ী এই সব ধর্মপ্রচারকরা বিশেষ বাণী প্রচার করলেও তাঁদের মূল কথা ঐশ্বরিক বাণী হিসাবে তাঁরা প্রচার করেছিলেন। সমাজকল্যাণে যে চিন্তা তাঁদের মনে এসেছিল তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন এটা বিশ্বপ্রভু প্রদত্ত বাণী। এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে। আমি তার মধ্যে ঢুকতে চাইছি না।

সাম্প্রদায়িকতার সূচনা পরাধীন ভারতে

আমি বলতে চাইছি, আজ যে ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশ দেখছেন তার সূচনা কিন্তু হয়েছিল ভারতবর্ষের গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেই। একদিকে স্বাধীনতা

তিনের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার গাববেড়িয়া অঞ্চলের প্রবীণ কর্মী আনন্দ সর্দার ৩ ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৬৭ সালে নির্বাচনের কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। তারপর থেকেই পার্টি পরিচালিত গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা— যেমন মজুরি বৃদ্ধি, ভাগচাষি আন্দোলন ও জাতপাতের বিরুদ্ধেআন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজের গ্রামে বলিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠন ভাঙতে সিপিআই(এম) বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ শুরু করে। কমরেড আনন্দ সর্দার সহ এলাকার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের তারা একাধিক মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়। জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রয়াত আনন্দ সরদার ও তার দুই পুত্র সহ ২৭ জন কর্মীকে খুনের মামলায় জড়িয়ে দেয়। ওই সময় নেতৃত্বের নির্দেশে দুই ছেলেকে দু'মাসের বেশি জেল হেফাজতে পাঠান তিনি। এতদসত্ত্বেও তিনি দলের কাজ থেকে বিরত হননি। নিয়মিত গণদাবী খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল। বয়সজনিত কারণে নিয়মিত পার্টির কাজ করতে না পারলেও প্রধান কর্মসূচিগুলিতে অংশগ্রহণ করতেন। এলাকার সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন। কর্মীদের কাজে উৎসাহ দিতেন, প্রয়োজনে নেতৃত্বের কাছে পাঠাতেন।

১১ এপ্রিল তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রামেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শ্যামল প্রামাণিক, কমরেড বিশ্বনাথ সরদার এবং কমরেড কনক সরদার। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সমরেন্দু রায়।

কমরেড আনন্দ সর্দার লাল সেলাম

বিজেপি-তৃণমূল সহ সব সরকারি দলই দুর্নীতিগ্রস্ত

দুয়ের পাতার পর

আন্দোলনে শত শত প্রাণ আত্মাহুতি দিয়েছে। ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন বীর শহিদরা। কত বিপ্লবী আন্দামানের সেলুলার জেলে ব্রিটিশের অত্যাচারে পাগল হয়ে গেছেন। কত দেশপ্রেমিক ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন এই স্বাধীনতা আন্দোলনে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব বিপ্লবীরা দিতে পারেনি। বিপ্লববাদী বলতে যাদের বলা হয়— ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন, সেই বিপ্লববাদী ধারা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে পারেনি। সে দিন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে মদত দিয়েছে জাতীয় বুর্জোয়ারা, যারা আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আজ যারা গোটা দেশকে শোষণ করছে, লুঠ করছে, এরাই সে দিন গান্ধীবাদীদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। তার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বিপ্লব সংগঠিত হতে পারেনি। এমনকি জাতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থে গান্ধীবাদী নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত পর্যন্ত করেছিল। এগুলো এখনকার অনেকেই জানে না।

এই কংগ্রেস ইংরেজের বিরুদ্ধে যেমন সশস্ত্র লড়াই করেনি, তেমনই এ দেশের ধর্মীয় চিন্তা, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা, জাত-পাত এ সবের বিরুদ্ধেও যে লড়াই দরকার ছিল সেটাও করেনি, এগুলির সাথে আপস করেছিল।

নবজাগরণের মনীষীরা ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সূচনা করেছিলেন

এই লড়াইয়ের সূচনা করেছিলেন নবজাগরণের প্রবর্তক রামমোহন। রামমোহন বেদান্তে বিশ্বাসী হয়েও ঘোষণা করেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা দরকার। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে সংস্কৃত শিক্ষা কয়েক হাজার বছর অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেছে। বলেছেন, এই শিক্ষার ফলে মিথ্যা অহঙ্কার জন্মায়। ইংরেজ সরকার সংস্কৃত পণ্ডিতদের দিয়ে সেটাই করানোর চেষ্টা করছে। বলেছেন, বেদান্ত পড়ে যথার্থ নাগরিক গড়ে উঠবে না। কেন না বেদান্ত বাস্তব জগতকে অস্বীকার করে। চাই বৈজ্ঞানিক দর্শন, চাই অ্যানাটমি, চাই কেমিস্ট্রি, চাই ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স— এই হচ্ছে রামমোহনের বক্তব্য। বিদ্যাসাগর আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, সমস্ত শাস্ত্রই মিথ্যা। আপনারা জানেন বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য লড়াই করেছেন। আপনারা জানেন বিদ্যাসাগর অনেক দান করতেন, গরিব মানুষকে অনেক সাহায্য করতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব। যে সাহসের সাথে তিনি শাস্ত্রীয় দুর্গকে আঘাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার প্রশংসা করে এ কথা বলেছিলেন। এই বিদ্যাসাগর ব্রিটিশ সরকারকে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, বেদ বেদান্ত মিথ্যা। বিদ্যাসাগর নিজে সংস্কৃত কলেজ থেকে সব শাস্ত্রে পাস করে বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন। সমস্ত হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। ২১ বছর বয়সে ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। তারপর তিনি বলেন, সাংখ্য-বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন। বললেন, আমাদের ইউরোপ থেকে এমন দর্শন পড়ানো উচিত যাতে ভারতীয় ছাত্ররা বুঝবে বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্র মিথ্যা। তিনি বলেছিলেন, এমন শিক্ষক চাই যিনি ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত, যিনি ইংরেজি জানেন, বাংলা জানেন। জ্যোতিরাও ফুলেও ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা যে নবজাগরণের আলো নিয়ে এলেন তা দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করতে চেয়েছিলেন। এ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজিকে সামনে রেখে এই লড়াইটাকে বাধা দিল। ফলে কংগ্রেস বাস্তবে 'হিন্দু জাতীয় কংগ্রেস' হয়ে গেল— গান্ধীজি যতই এক হাতে গীতা আর এক হাতে কোরান নিন না কেন! গান্ধীজি তো প্রার্থনা সভায় রামধুন গেয়ে, রামরাজত্বের কথা বলে রামকেই সামনে এনেছিলেন। ঈশ্বর-আল্লাহ তেরা নাম— এইসব যতই বলুন না কেন, কংগ্রেসে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য থেকে গেছে ধর্মের সাথে আপস করার ফলে। ফলে ব্যাপক সংখ্যক মুসলিমরা গান্ধীজিকে দেখেছেন হিন্দু সন্ন্যাসী হিসেবে। বিভেদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার সুযোগ নিয়েছে ইংরেজরা। তারা মুসলিমদের বুঝিয়েছে, কংগ্রেসে তো হিন্দু নেতৃত্ব। মুসলিমদের মধ্যে যারা ক্ষমতালোভী তারাও বুঝিয়েছে, এ তো হিন্দু নেতৃত্ব। শুধু কি হিন্দু নেতৃত্ব? এ হচ্ছে উচ্চ বর্ণের হিন্দু নেতৃত্ব। ফলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু, যাদের দলিত বলা হয়, তারাও কংগ্রেসের উচ্চবর্ণের নেতৃত্বকে দেখে কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্মবোধ করেনি। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনেও তারা আসেনি। এই যে বিভাজনটা থেকে গেল গোটা দেশে, পরবর্তীকালে কংগ্রেস তাকে ব্যবহার করেছে।

শহিদ মিনারের সমাবেশে শ্রোতাদের একাংশ। ২৪ এপ্রিল

যথার্থ সেকুলারিজম কী

কংগ্রেসকে যারা সেকুলার বলে তারা সেকুলার বলতে কী বোঝে? যথার্থ সেকুলারিজম কাকে বলে? কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, সেকুলার কথার অর্থই হচ্ছে পার্থিব। বাস্তব জগতের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই সব কিছু বুঝতে হবে। একটি সেকুলার রাষ্ট্র ধর্মকে উৎসাহ দেবে না, বাধাও দেবে না। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি-সমাজ এ সব ক্ষেত্রে ধর্মের কোনও ভূমিকা থাকবে না। ধর্ম ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠানের বিষয় হিসাবে থাকবে। সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বলেছেন, রাজনীতি ধর্ম কিংবা অতীন্দ্রিয় চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। রাজনীতি পরিচালিত হবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধর্মের মোহ মানুষকে নির্জীব করে, ফলে রাজনীতিতে তা আসা উচিত নয়। শরৎচন্দ্র আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার। আজ যাঁরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছেন, তাঁরা আমাদের অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্র—এঁদের কি অস্বীকার করতে পারেন? এঁদের ভিত্তি করেই তো একসময় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো'। গোটা ভারতবর্ষ তাঁদের এই ভাবে দেখত। আজ সেই পশ্চিমবঙ্গকে প্রথমে কংগ্রেস, পরবর্তীকালে সিপিএম আর এখন তৃণমূল ও বিজেপি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! একদল যুবক চাকরির লোভে, টাকার লোভে, অন্য নানা কারণে তাদের পিছনে ছুটছে। এটা খুবই বেদনাদায়ক।

দেশে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে মানুষ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে না, যন্ত্রণায় ছটফট করছে না। কী ভাবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হল? এটা কি অনিবার্য ছিল? এটা নিয়ে মানুষ যাতে ভাবতে না পারে তার জন্যই ওই মন্দির, মসজিদ, পুজো, ধর্মীয় প্রচার— এই দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে। শুধু মুসলিমদেরই নয়, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা দলিত হিন্দুদের ওপরও চলছে অত্যাচার। দলিতদের খুনও করা হচ্ছে। এ সবই হচ্ছে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে।

বিজেপি-তৃণমূল সহ সব সরকারি দলই দুর্নীতিগ্রস্ত

এই যে আপনারা দেখলেন আর জি করে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল। একজন মহিলা ডাক্তার কলেজ কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ধরে ফেলেছিলেন, তার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁকে খুন করল। এই যে ঘটনা ঘটল এর সাথে গোটা প্রশাসন যুক্ত। আজও তার কোনও ন্যায়বিচার মেলেনি। অন্য দিকে হাজার হাজার শিক্ষক রাস্তায় বসে আছেন। একদল অনশন করছেন। যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি শেষ হয়ে গেল। কারণ দুর্নীতির পথে আর একদল চাকরি পেয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও বলছে, যোগ্য-অযোগ্য আছে। তা হলে কোন যুক্তিতে যোগ্যরা চাকরি হারাবে? এটা কি ন্যায়বিচার? আজ এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা কী? এমনিতেই স্কুলগুলো ধুঁকছে শিক্ষকের অভাবে, পরিকাঠামোর অভাবে। আর এখন শিক্ষকরাও স্কুলে যাচ্ছেন না। গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-সি কর্মীর অভাব। এই ভাবে একটা প্রচণ্ড সংকট তৈরি করল। এখানেও দুর্নীতি, আর জি কর হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি। সারা দেশের সব সরকারি দলই আজ আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দুর্নীতি।

সিবিআই এখন বিরোধীদের ধরছে। যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল, আপনাদের মনে আছে কি না জানি না, তখন সিবিআই বিজেপি বা বিরোধীদের ধরত। তখন সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে সিবিআই হচ্ছে কংগ্রেসের খাঁচায় শৃঙ্খলিত তোতা পাখি। এখন সিবিআই একই খাঁচায় আছে কিন্তু তার মালিক হচ্ছে বিজেপি। তাই বিজেপির কোনও মুখ্যমন্ত্রী, কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কোনও দুর্নীতি তারা দেখতে পায় না। তারা যেন সব নিষ্পাপ! বিরোধীদের ধরছে, তারা দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকই। কিন্তু বিজেপির দুর্নীতি নেই, এ কথা তো বলা যাবে না। মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের আমলে প্রশ্নপত্র নিয়ে, উত্তরপত্র নিয়ে বিরাট ব্যপম কেলেঙ্কারি ঘটেছিল। এই দুর্নীতির মামলায় বহু সাক্ষী খুন হয়ে গেছে। যে সাংবাদিকরা দুর্নীতির রিপোর্ট লিখেছেন, তাঁদেরও খুন করা হল। কোনও বিচার হয়নি। কর্ণাটকের বিজেপি শাসনে বিজেপিরই লোক এক কন্ট্রাকটর প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখল, আমার কাছে কাটমানি চাইছে ফরটি পার্সেন্ট। তা হলে আমি যা ব্যাঙ্ক লোন নিয়েছি শোধ করতে পারব না। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চিঠি লিখে আত্মহত্যা করল সেই কন্ট্রাক্টর। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যারা এত ধর্মের বাণী উচ্চারণ করছে, তারাই আকণ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত।

দুর্নীতির উৎস কী

এই দুর্নীতির উৎস কোথায়? এর উৎস হচ্ছে এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। গোটা সমাজব্যবস্থাই আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। সমাজ ব্যবস্থা বলতে বোঝায় সমাজের যারা পরিচালক, যারা সমাজকে কন্ট্রোল করে। সমাজকে কে কন্ট্রোল করে? আমাদের মূল জীবন হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবন। ফলে অর্থনীতিকে যে কন্ট্রোল করে সেই সমাজকে কন্ট্রোল করে। বহুদিন আগে মার্ক্স বলে গিয়েছিলেন, এই পুঁজিবাদ চরম প্রতিক্রিয়াশীল। এই পুঁজিবাদ চরম অমানবিক। এর চাই শুধু মুনাফা— এর জন্যই শ্রমিক শোষণ। আর এখন সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য চলছে সর্বাপেক্ষা শোষণ। মানুষকে যত নিংড়ে নিতে পারে তত মুনাফা। সমগ্র বিশ্বের পুঁজিবাদ আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তাতে তা আর নীতি-আদর্শ-মানবিকতা-গণতন্ত্র— কোনও কিছুর ধার ধারে না। তার একমাত্র লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা। এর জন্য একের সাথে অন্যের কম্পিটিশন চলছে। এমনকি এর জন্য তাদের নিজেদের তৈরি আইনকেও যদি লঙ্ঘন করতে হয় তাও তারা করে। এই পুঁজিবাদ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে এই পুঁজিবাদকে রক্ষা করছে যে পুঁজিবাদী রাজনীতি ও রাজনীতিবিদরা, তারাও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং গোটা সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে।

ভারতবর্ষের পরিস্থিতি কী সে বিষয়ে আমি আপনাদের একটা হিসাব দেখাতে চাই। আমাদের দেশের ১০ শতাংশ মানুষ যারা অতি ধনী, তারা দেশের মোট সম্পদের ৭৭ শতাংশের মালিক। আর সবচেয়ে গরিব ৬৭ কোটি মানুষ মাত্র ১ শতাংশ সম্পদের মালিক। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা! এ দেশে বিজেপির স্নেহধন্য, যার মদতে, আর্থিক সাহায্যে বিজেপি ইলেকশন করে, যার বিরুদ্ধে অনেক জালিয়াতির অভিযোগ, সেই আদানির আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। মুকেশ আম্বানির আয় ৯ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। আর এ দেশের ১০০ জনের মধ্যে ৬০ জনের দৈনিক রোজকার ২০ টাকা। ২১ ভাগ মানুষের দৈনিক রোজকার ১৬৬ টাকা।

চারের পাতায় দেখুন

এ রাজ্যে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির সূচনা সিপিএম শাসনেই

তিনের পাতার পর

আমাদের দেশে প্রতি বছর ১০ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায়। প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ হাজার শিশু অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এ দিকে সরকারের বৈদেশিক ঋণ ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা। দেশীয় ঋণ ১৫৫ লক্ষ কোটি টাকা। অন্য দিকে পুঁজিপতিদের করছাড় ও ঋণমকুব করেছে ৯ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। ব্যাঙ্ককে দিয়ে মকুব করিয়েছে ১৬ লক্ষ কোটি টাকা। অথচ ঋণের দায়ে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ আত্মহত্যা করছে। তা হলে এই সরকার কার?

আগে যেখানে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ মধ্যবিত্ত

মধ্যপ্রদেশের ভোপালে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সভা

ছিল, সেই মধ্যবিত্তের সংখ্যা নামতে নামতে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৬০ লক্ষে। ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্ত নেই, তারা গরিব হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে তিন বছর আগের হিসাব, এখন নিশ্চয় আরও বেড়েছে। এই হচ্ছে ভারতের অবস্থা। কোটি কোটি বেকার, অর্ধ বেকার। অসংখ্য ছাঁটাই। লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন কোথাও স্থায়ী মজুর নেই। স্থায়ী মজুর হলে স্থায়ী বেতন দিতে হয়, কিছু আইনসঙ্গত অধিকার মানতে হয়। এটা তুলে দিয়েছে কেন্দ্র-রাজ্য সব সরকারই। রেলে, ব্যাঙ্কে, নানা সরকারি জায়গাতেও তুলে দিয়েছে। বেসির ভাগই এখন কন্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ করে, আর কন্ট্রাক্টর তার যেমন খুশি তেমন বেতন দেয়। যতক্ষণ ইচ্ছা খাটায়। আট ঘণ্টা শ্রমদিবস উঠে গেছে। মালিকের যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ খাটতে হবে। যেহেতু লোকের এমনিতেই কিছু রোজগার নেই, তাই বলতে পারে না— আমাকে এত টাকা না দিলে কাজ করব না। যা দেবে তাতেই কাজ করতে হবে। এই হচ্ছে দেশের শ্রমিকদের অবস্থা। কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে লাখে লাখে মানুষ ছুটছে শহরে শহরে। শহরের বাইরে দেশে-বিদেশে ছুটছে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে।

সম্প্রতি ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্যদের মধ্যে মারা গেল ভারতের এইসব শ্রমিকরা। চাকরি দেওয়ার নাম করে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছে তাদের। প্যালেস্টাইন আক্রমণে ইজরায়েল তার দেশের যুবকদের সৈন্য হিসাবে কাজ করাচ্ছে। তা হলে ইজরায়েলে অন্য প্রয়োজনীয় কাজ কে করবে? ভারত থেকে তারা যুবকদের নিয়ে যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে। সৌদি আরবে যান, দুবাইতে যান দেখবেন ভারতীয় শ্রমিক, বাংলাদেশের শ্রমিক, নেপালের শ্রমিক, শ্রীলঙ্কার শ্রমিক— অসংখ্য গরিব মানুষ সেখানে কাজ করছে। সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত অমানবিক জীবন তাদের।

এখন নতুন এসেছে গিগ লেবার। এই যে গিগ লেবার, মাইগ্র্যান্ট লেবার, আরও নানা ধরনের শ্রমিক— এ সব আপনারা আগে কখনও শুনেছেন? যাদের জীবনে কোনও স্থায়ী আয় নেই, নিরাপত্তা নেই। ছন্নছাড়া জীবন, পরিবারও ছন্নছাড়া। কেউ কেউ স্ত্রীকে নিয়ে যায়। অনেকে নিয়ে যায় না। সেখানে হয়তো আর একজনকে নিয়ে থাকে। কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। পুঁজিবাদ আজ গ্রামকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। আগে যে গ্রামীণ সংস্কৃতি ছিল, গ্রামীণ একটা পরিবেশ ছিল, একে অপরকে দেখত, একটা গ্রামীণ সমাজ ছিল। সেখানে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, বড়দের প্রতি মান্যতা— এইসব ছিল। এগুলি সব ধসে গেছে।

সমাজের এ রকম একটা পরিস্থিতি কে তৈরি করল? এই পুঁজিবাদ— যে পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে, যে পুঁজিবাদ মাল্টিন্যাশনালের জন্ম দিয়েছে। আপনারা ভাবতে পারেন, মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়েতে, অঘোষিত ব্যয় বাদ দিন, ঘোষিত ব্যয় অন্তত পাঁচ হাজার কোটি টাকা। আমন্ত্রিত কারা? সব তাঁর ভক্ত প্রজার দল। এই বিজেপি নেতারা, কংগ্রেস নেতারা, আঞ্চলিক দলের নেতারা, এ রাজ্যের তৃণমূলের নেতারা— এরা তো সব তাদের খাস প্রজা। কারণ তাদের টাকায় এই দলগুলি চলে। তাদের টাকাতেই এদের মন্ত্রিত্ব। তাদের টাকাতেই কাগজে তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারে, ভোটের প্রচারে লাগে। সব গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মুকেশ আম্বানির বাড়ির বিয়েতে। বিজেপি তো একটা সামরিক বিমানবন্দরও খুলে দিল আম্বানির অতিথিদের আসার জন্য। এই হচ্ছে পুঁজিপতিদের রাজত্ব। এই পুঁজিপতিরাই হচ্ছে দেশের অঘোষিত রাজা। প্রজাতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের নামে অঘোষিত রাজতন্ত্র। এরাই ঠিক করে এ বার কংগ্রেস না বিজেপি, কে ক্ষমতায় বসবে। এরাই ঠিক করে সরকারে তৃণমূল থাকবে, কি থাকবে না। এরাই ঠিক করে সরকারে নীতীশকুমার থাকবে, কি থাকবে না। খবরের কাগজ, টিভি সব ওদের হাতে। কাগজ খুলুন— এদের বিজ্ঞাপনে ভর্তি। টিভি দেখুন— এদেরই বিজ্ঞাপন। কাগজ-টিভির মালিকরা বলবে এদের ছাড়া আমাদের কাগজ চলবে না। ওরাই ঠিক করে কাকে প্রচার দিতে হবে।

যে ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, ইমার্জেন্সি জারি করেছে, তাদের প্রচারে এই ইন্দিরা গান্ধীই 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' হয়ে গিয়েছিল। আবার ওরাই প্রচার করেছিল, অটলবিহারী 'সুদিন' নিয়ে আসবে, 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসবে নরেন্দ্র মোদি। সবার পকেটে ১৫ লক্ষ টাকা ঢুকিয়ে দেবে, প্রতি বছর ২ কোটি লোকের চাকরি দেবে, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেবে। সাংবাদিকরা অমিত শাহকে প্রশ্ন করলেন, এই সব প্রতিশ্রুতির কী হল? বললেন, বুঝতে পারলেন না, এগুলো সব জুমলা। মানে এগুলো ভোটের সময় বলতে হয়। এ রকম করে বলতে এই সব নেতাদের একটু লজ্জা পর্যন্ত হয় না! এ ভাবেই এরা মানুষকে ঠকায়।

মানুষ পশ্চিমবঙ্গে
কেন পরিবর্তন চেয়েছিল

এ রাজ্যেও পরিবর্তনের নামে কী হচ্ছে আপনারা দেখছেন। এক সময় সিপিএমের শাসন ছিল। বাংলার একটি দৈনিক সংবাদপত্র যথার্থই লিখেছিল তাদের সম্পাদকীয়তে, গাছের একটা পাতা নড়বে কি না, শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়া মিটবে কি না, সব আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ঠিক করে দিত। তখন সমস্ত কিছুই তারা কন্ট্রোল করত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সিপিএম ক্ষমতায় এসেছিল। তারপর শুরু হল বিভিন্ন দলের ওপর আক্রমণ। নদিয়াতে আন্দোলনকারী কৃষকদের হত্যা করল, চটকলের শ্রমিকদের হত্যা করল, বন্দরের শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করল আন্দোলন করছে বলে। আমাদের তো প্রায় ১৫৯ জন নেতা-কর্মীকে খুন করেছে ওরা। আমরা যেহেতু ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রাথমিক স্তরে লড়াই করেছিলাম, পাশ-ফেল প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য লড়াই করেছিলাম, মূল্যবৃদ্ধি ও বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তাই আমাদের দলকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, নির্মূল করতে হবে। ফলে আমাদের নেতা-কর্মীদের খুন করল। স্কুলের পিয়ন থেকে ইউনিভার্সিটির উপাচার্য— সব কিছু তারা কন্ট্রোল করত। থানা কন্ট্রোল করত, পুলিশ প্রশাসনের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করেছিল। প্রোমোটারি, কন্ট্রাকটরি, সিন্ডিকেট রাজত্ব— এই সব তো এ রাজ্যে সিপিএমই এনেছিল। এই রাজ্যে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বলে একটা কথা চালু হল যা সিপিএম শাসনের আগে কেউ জানত না। রাজনীতি মানেই পেতে হবে। পঞ্চায়েত দেবে, কর্পোরেশন দেবে, সরকার দেবে। ফলে সরকারকে সমর্থন করো, মানে সিপিএমকে সমর্থন করো। ৩৪ বছর তারা এই ভাবেই চালিয়েছে। আজ তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কী করে বিচ্ছিন্ন হল? নেতারা কি জনগণের কাছে ভুল স্বীকার করবেন? ওরা কোনও দিনই মার্ক্সবাদী ছিল না, এ কথা কেন বলছি সেই আলোচনায় আজ যাচ্ছি না।

এ রাজ্যে ১৯৬৭, '৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, একটা বামপন্থী সরকার বুর্জোয়া সরকারের মতো শাসন করতে পারে না। তিনি বললেন, এই সরকারের পুলিশ গণআন্দোলনে হস্তক্ষেপ করবে না। এই সরকার শ্রেণিসংগ্রাম, গণআন্দোলনকে

প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা মুম্বাইয়ে।
বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ

উৎসাহিত করবে। কিন্তু এই নীতি সিপিএম তাদের ৩৪ বছরের শাসনে মানেনি, এই নীতি তারা লঙ্ঘন করেছে। তার ফলে সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ক্রমাগত বেড়েছে। তারপর নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে তারা শুধু প্রতিবাদী মানুষকে গুলি করে হত্যা করেনি, পুলিশকে দিয়ে, সমাজবিরোধীদের দিয়ে নন্দীগ্রামে মহিলাদের ধর্ষণ পর্যন্ত করিয়েছে। সেই সুযোগ নিয়ে সংবাদপত্র অগ্নিকন্যা হিসেবে তৃণমূল নেতৃত্বকে তুলল। পরিবর্তন করবে, পরিবর্তন করবে বলে তার বিরাট প্রচার তুলল বিকল্প হিসেবে। এখন তারই শাসন চলছে। আমরা একে বলেছি, সিপিএম শাসনেরই কার্বন কপি। পার্থক্য হচ্ছে সিপিএমের শাসন ছিল সুসংগঠিত। আর এরা ঢিলেঢালা। এরা দুর্নীতি করে ধরা পড়ে যায়। ওদের ধরা ছিল মুশকিল, খুব সূক্ষ্ম কায়দায় ওরা কাজ করত।

সিপিএমের কোনও নেতা-কর্মী যদি এখানে থাকেন, তাঁদের বলতে চাই, আমাদের কোনও সিপিএম-বিদ্বেষ নেই। আমরা চাই সিপিএম বামপন্থী আন্দোলনে আসুক, সংগ্রামে নামুক। কিন্তু ভোটের স্বার্থে আন্দোলনের মহড়া নয়। কংগ্রেসকে 'সেকুলার' বলে তার সঙ্গে জোট করা নয়। এটাকে কি সেকুলারিজম বলে? বিজেপির বিরোধিতা করা মানেই সেকুলার? সেকুলার কথার তো একটা অর্থ আছে, যেটা আমি আগে আলোচনা করেছি। কংগ্রেস কি গণতান্ত্রিক? ইমারজেন্সি কে জারি করেছিল? টাডা, এসমা, মিসা এইসব দানবীয় অগণতান্ত্রিক আইন কে তৈরি করেছিল? কংগ্রেস করেনি? কংগ্রেস দাঙ্গা বাধায়নি রাউরকেলায়, ভাগলপুরে, নেলিতে? সর্বশেষ দিল্লিতে তারা শিখদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধায়নি? সিপিএম নেতাদের প্রশ্ন করতে চাই, সেই কংগ্রেসকে আপনারা সেকুলার এবং গণতান্ত্রিক বানাচ্ছেন! বাকি আঞ্চলিক দলগুলিও তো তাই। তাদের চরিত্র কী? এ সবই তো আপনারা করছেন ভোটের স্বার্থে।

আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি, আপনারা জনগণের স্বার্থে প্রকৃত গণআন্দোলনে আসুন। তার আগে আপনাদের ভুল স্বীকার করতে হবে। এ

পণ্ডিচেরির সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে শ্রীধর

বিষয়ে মহান লেনিনের শিক্ষা কী ছিল? তিনি বলেছেন, প্রকৃত কমিউনিস্টরা ভুল স্বীকার করে। তারা শুধু প্রকাশ্যে ভুল স্বীকারই করে না, কেন ভুল হল তার কারণ খুঁজে জনগণের কাছে জানায়। আর ওই ভুল কী ভাবে সংশোধন করবে সেটাও জনগণের কাছে জানায়। কোনও দল যথার্থ বিপ্লবী কি না, এটাই হচ্ছে তার মাপকাঠি। সিপিএমের নেতারা কখনও স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা ভুল করেছেন? তারা কখনও স্বীকার করেছেন যে এই বিজেপির উত্থানে তাদের কী ভূমিকা ছিল? জরুরি অবস্থার আগে, আপনারা অনেকেই জানেন না, গত শতকের '৭৩-'৭৪ সালে গোটা ভারতবর্ষে একবার প্রবল কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন ছাত্র-যুবকরা সংগঠিত করেছিল। দাবিগুলি ছিল গণতান্ত্রিক, শিক্ষা ও চাকরির দাবিতে, দুর্নীতি ও

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিজেপি নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী

চারের পাতার পর

অপশাসনের বিরুদ্ধে। সেই সময় সিপিআই খোলাখুলি ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করত, সিপিএম ঘুরিয়ে করত। ওই কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে ঢুকল হিন্দু মহাসভা, আরএসএস, জনসংঘ। এর আগে তাদের তেমন শক্তি ছিল না। আমরা তখন সিপিএম-সিপিআইকে বললাম, আসুন, এই আন্দোলনে আমরা বামপন্থীরা নামি, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিই। ওরা রাজি হয়নি। বলল, আন্দোলনে আরএসএস আছে, জনসংঘ আছে। আমরা বললাম, যেহেতু আমরা নেই তাই ওরা আছে। আসুন, আমরা বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে নেতৃত্ব দিয়ে ওদের বিচ্ছিন্ন করি। ওরা রাজি হয়নি। আসলে ওরা ইন্দিরা গান্ধী বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেতে রাজি ছিল না। তখন ইন্দিরা গান্ধী ওদের চোখে প্রগতিশীল। আবার যেই জরুরি অবস্থার পর ভোট হল '৭৭ সালে, রাতারাতি আরএসএস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি, জগজীবন রামের পার্টি— আরও অনেকে মিলে জনতা পার্টি তৈরি হল মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে। সিপিএম দেখল, এরাই জিতবে। জনসংঘ-আরএসএস আছে জেনেও সিপিএম সঙ্গে সঙ্গে এই জনতা পার্টির সাথেই ঐক্য করল। পরে রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে ভিপি সিং যখন সরকার গড়ছেন, সেই ভিপি সিং সরকারকে একদিকে সিপিএম, অন্য দিকে বিজেপি সাপোর্ট করেছিল। এ কথা তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন? এই কলকাতার ময়দানে বাজপেয়ী-জ্যোতি বসু একত্রে মিটিং করে গেছেন। অস্বীকার করতে পারেন? এগুলো সুবিধাবাদ নয়? আপনাদের তো এ সব স্বীকার করতে হবে, যদি আপনারা সৎ হন। ৩৪ বছর যে সব বামপন্থা বিরোধী কাজ করেছেন, অন্যায় করেছেন, সেইগুলি কি একবারও স্বীকার করেছেন? ৩৪ বছর যদি আপনারা যথার্থই বামপন্থার চর্চা করে থাকেন, তা হলে আজ পশ্চিমবাংলায় দক্ষিণপন্থীরা, বিজেপি, তৃণমূল শক্তিশালী হল কী করে? আর সিপিএমেরই বা এই হাল হল কী করে? এখনও তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে সিপিএমকে মানুষ নিচ্ছে না কেন? কেন তাদের একটা সিটের জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াতে হচ্ছে? এর জন্যে কর্মীদের দায়ী করলে চলবে? নেতৃত্ব দায়ী নয়? কর্মীদের বিপথে চালাল কে? আদর্শের প্রতি যদি আপনারা সৎ থাকেন, জনগণের

প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় যোগ দিতে জৌনপুরে মিছিল। উত্তরপ্রদেশ।

প্রতি যদি আপনারা সৎ থাকেন, কর্মীদের বিভ্রান্ত করবেন কেন? সরাসরি স্বীকার করুন যে, আমরা এগুলো ভুল করেছি। আমরা এখন সঠিক পথে চলব। আবার বলছি, আপনাদের প্রতি আমাদের অন্য কোনও বিদ্বেষ নেই। ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল, সিপিএম আজ বাস্তবে একটা রিভিশনিস্ট, রিফর্মিস্ট লেফটিস্ট পার্টি আর আমরা রেভলিউশনারি লেফটিজমের চর্চা করছি।

বিজেপি নবজাগরণ বিরোধী

আমি আপনাদের বলতে চাই— এই বিজেপি নবজাগরণের ধ্যান-ধারণার বিরোধী। বিজেপিকে যদি আপনারা স্বীকার করেন তা হলে আপনাদের রামমোহনকে অস্বীকার করতে হবে। বিদ্যাসাগরকে অস্বীকার করতে হবে। জ্যোতিবা ফুলেকে অস্বীকার করতে হবে। ভারতীয় নবজাগরণকে অস্বীকার করতে হবে। এই মহাপুরুষরা লড়াই করেছিলেন ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে। বিজেপি আজ শিক্ষাক্ষেত্রে সেই ধর্মীয় শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনছে। সেই মনুসংহিতা, সেই গীতা, সেই রামায়ণ, মহাভারত, অধ্যাত্মবাদ— এই সব নিয়ে আসছে।

বিজেপি স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধী

আপনারা জানেন, আরএসএস আগাগোড়া স্বদেশি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। যিনি ওদের চিন্তানায়ক বলে পরিচিত, সেই গোলওয়ালকর বলেছিলেন, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল। ব্রিটিশ বিরোধীরা যথার্থ দেশপ্রেমিক নয়, যথার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী নয়। চাই হিন্দুত্ববাদ

শহিদ মিনার ময়দান। ২৪ এপ্রিল

ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এই হচ্ছে আরএসএস-এর বক্তব্য। গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের কোথাও বিজেপির পূর্বসূরি হিন্দুমহাসভা, আরএসএসের ভূমিকা নেই। ওদের নেতা সাভারকরই ১৯৩৭ সালে আহমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে প্রথম দাবি করেছিলেন— দেশভাগ হোক। এই সাভারকর আন্দামান জেল থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার যা করতে বলবে তাই করব। তার তিন বছর বাদে মহম্মদ আলি জিন্নাহ দেশভাগের দাবি তুলেছিলেন। অনেকেই জানেন না, এই দেশভাগকে সমর্থন করেছিল সেই সময়ের সিপিআই, যার থেকে ভেঙে এখন সিপিএম হয়েছে। তারা বলেছিল, হিন্দু এক জাতি, মুসলিম আলাদা জাতি। ১৯৪৬ সালে যখন দেশভাগের কথা ওঠে, তখন অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লিগ আর হিন্দু মহাসভা যুক্তভাবে সরকার চালাচ্ছিল। সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও ছিল মুসলিম লিগ আর হিন্দু মহাসভার যুক্ত সরকার। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ফজলুল হক আর উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন— যারা এই সব বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, পরবর্তীকালে যার থেকে বিজেপি তৈরি হয়েছে, এই হচ্ছে তাদের ভূমিকা। তারা একদিকে ছিল নবজাগরণের বিরুদ্ধে, আর এক দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলিম হয়েছে ঃ বিবেকানন্দ

একটা প্রসঙ্গ আমি আগেও তুলেছি, আজও আবার তুলতে চাই। যথার্থ ধর্ম প্রচারক ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি যদি সঠিক হন, তা হলে বিজেপিকে কী বলবেন? বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয় অত্যাচারিত মানুষের মনে মুক্তির স্বাদ এনেছিল। এ দেশের নিম্ন বর্ণের গরিব হিন্দুরা জমিদার ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মুসলিমরা অস্ত্রের জোরে এদের জয় করেনি। তিনি বলেছেন, আমার যদি একটা ছেলে থাকত, তাকে শুধু মনসংযমের অভ্যাস ও এক পংক্তি প্রার্থনার মন্ত্রপাঠ ছাড়া আর কোনও ধর্ম শিক্ষা দিতাম না। তারপর সে বৌদ্ধ হতে পারে, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান হতে পারে, আমি নিজে মুসলিম হতে পারি। কী ক্ষতি! বলেছেন, আমরা সব ধর্মকে শুধু সমর্থনই করি না, শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস করি। মানবজাতিকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চাই যেখানে বেদ থাকবে না, কোরান থাকবে না, বাইবেল থাকবে না। সবকিছু মিলে এক হবে। বিবেকানন্দ বলছেন, কোনও ধর্ম অত্যাচার করতে শেখায়নি। কোনও ধর্মই নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে শেখায়নি। তা হলে অত্যাচার করতে শেখালো কে? ধর্ম নয়, রাজনীতি। বিবেকানন্দ এমনও বলেছেন, ওই সব ঘন্টা-ফন্টা গঙ্গার জলে ফেলে দাও। তিনি বলেছেন, কোটি কোটি টাকা খরচা করে কাশী-বৃন্দাবনে মন্দির গড়ছো, মূর্তি গড়ছো, আর আসল ঠাকুর, গরিব মানুষ অনাহারে মরছে! বিবেকানন্দ বলছেন, যে দেশের কোটি কোটি মানুষ অনাহারে, অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে, সে দেশে তাদের পয়সায় শিক্ষিত হয়ে যারা তাদের দিকে ফিরে তাকায় না, আমি তাদের বিশ্বাসঘাতক বলি। এই বিচারে আজকের রাজনৈতিক নেতাদের কী বলবেন? বিবেকানন্দ বলেছেন, যে দেশের ২০ কোটি মানুষ অনাহারে পশুর মতো জীবন যাপন করে, সেখানে তাদের পায়ের তলায় পিষে যারা অর্থ রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়ায় আমি তাদের হতভাগা পামর বলি। এই বিবেকানন্দকে কি বিজেপি নেতারা চেনেন? বিবেকানন্দের মাপকাঠিতে এইসব বিজেপি নেতাদের স্থান কোথায়, বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের স্থান কোথায়? বিবেকানন্দ বেদান্তে বিশ্বাসী ছিলেন, আর আমরা মার্ক্সবাদী। এখানে তাঁর সাথে আমাদের পার্থক্য আছে। কিন্তু আবার এই বিবেকানন্দকেই আমরা শ্রদ্ধা করি। আর এই জন্যই আমরা বলি, বিজেপি হিন্দু ধর্ম মানে না। না হলে বলতে হয়, বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম মানতেন না! রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্ম মানতেন না! রামকৃষ্ণ যেমন কালী পুজো করেছেন, তেমনই মসজিদে নামাজ পড়েছেন, গির্জায় প্রার্থনাও করেছেন। তিনি বলছেন, কেউ বলে জল, কেউ বলে ওয়াটার, কেউ বলে পানি, তেমনই কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লাহ, কেউ ডাকে ভগবান, ব্যাপারটা একই। আর আজ দেশে বিজেপি-আরএসএস কী করে বেড়াচ্ছে!

পুঁজিবাদ চায় ধর্মান্ধতা বাড়ুক

আপনাদের আমি বলতে চাই, আজকের দিনের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ ধর্মকে অপব্যবহার করছে। তার উদ্দেশ্য কী? পুঁজিবাদী শাসকরা চায় মানুষের মধ্যে ধর্মান্ধতা বাড়ুক। কারণ ধর্মান্ধতা বাড়লে মানুষ অদৃষ্টে, কপালতত্ত্বে বিশ্বাস করবে। তাদের বোঝানো যাবে, এই যে তুমি না খেয়ে মরছ, এ তোমার পূর্বজন্মের কর্মফল। তোমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল কেন? পাপ করেছ, তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। সবই বিধির বিধান, খোদা কা মর্জি, নসিব কা খেল। তাঁর ইচ্ছাতেই কর্ম। সবই তাঁর ইচ্ছা। এমনিতেই আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম হয়নি। তার উপযোগী সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়নি। ফলে দেশে ধর্মান্ধতা রয়েছে। অধিকাংশ গরিব মানুষ শিক্ষা বঞ্চিত, ধর্মান্ধ। তারা অত্যাচারিত এই দুনিয়ায় ন্যায়বঞ্চিত হয়ে কল্পিত উপরওয়ালাকে আঁকড়ে ধরছে পরজন্মে সুবিচারের প্রত্যাশায়। পুঁজিবাদী শাসকদের চেষ্টা তাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। যাতে মানুষ তার জীবনের সংকটের জন্য সরকারকে দায়ী না করে। যাতে মানুষ পুঁজিবাদকে শত্রু মনে না করে। যাতে তার বিরুদ্ধে লড়তে না পারে। আর ফ্যাসিবাদের প্রয়োজনে ধর্মান্ধতাকে কাজে লাগানো যায়।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ মানবজাতির চরম শত্রু। আপনারা লক্ষ করছেন, একচেটিয়া পুঁজির মালিক বহুজাতিক সংস্থাগুলো খুচরো ব্যবসাকে আক্রমণ করছে। টাটা, আম্বানিদের মতো দেশি একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বিদেশি ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন— এরা দোকান খুলে শাকসব্জি, মাছ, তেল-নুন পর্যন্ত বিক্রি করছে। ফলে পাড়ায় খুচরো দোকানদার যাদের দেখেন, যে সব বাজারে আমরা জিনিসপত্র কিনি, সব উঠে যাবে। একচেটিয়া পুঁজির মালিক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিরা দখল করবে এই সব জায়গা। বৃহৎ পুঁজি ক্ষুদ্র পুঁজিকে উৎখাত করবে।

অর্থনীতির সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতেই যুদ্ধ

একই কারণে প্যালেস্টাইন আজ আক্রান্ত। প্যালেস্টাইন যুদ্ধ আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন। যুদ্ধে চাই অস্ত্র। যুদ্ধ হলে ইজরায়েল অস্ত্র কিনবে। তা সরবরাহ করবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সর্বাত্মক সংকটে দীর্ণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনও বাজারের নিশ্চয়তা নেই। এ ছাড়া তাদের অর্থনীতি চলে না। ফলে যুদ্ধ চাই। আর চাই ইজরায়েলের সাহায্য নিয়ে বিস্তীর্ণ ভূ-

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

জতুগৃহ বাজার

কলকাতার ঋতুরাজ হোটেলে আগুন লেগে ১৪ জন মানুষের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের আবার দেখিয়ে দিল নিরাপত্তার নিয়ম অমান্য করাটা কত বিপজ্জনক হতে পারে। একই সাথে দেখা গেল, কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূদের প্রয়োজনে সরকারি নজরদারিতে ঘাটতি কী বিপর্যয় ডেকে আনে।

এ রকমই একটা উদাহরণ কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পুরনো একটি সিনেমা হলের বিল্ডিংয়ে বিশাল 'রিটেল স্টোর'। এই ক্ষেত্রে পুরসভার অনুমোদন, দুর্ঘটনার সময় বেরনোর বিকল্প পথ, খোলা জায়গা, আপৎকালীন জলের রিজার্ভার ইত্যাদি না থাকায় কয়েক বছর ধরে দমকলের ছাড়পত্র আটকে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কোনও নিয়ম না মানা সত্ত্বেও বিস্ময়কর ভাবে দমকল ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। ফলে কার্যত সম্ভাব্য জতুগৃহে এই বাজার চলছে। এর যথাযথ তদন্ত এখনই করার দাবি জানাচ্ছি। জনবহুল জায়গায় সুরক্ষিত থাকার অধিকার একটা আবশ্যিক নাগরিক অধিকার। তা থেকে কলকাতার মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না।

ছায়া মিত্র, কলকাতা-১

যুদ্ধের পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদী বাজার সঙ্কট

পাঁচের পাতার পর

ভাগ ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সেই কারণে প্যালেস্টাইনে একটা জাতিকে তারা উৎখাত করে দিচ্ছে। গাজা ভূখণ্ডকে তারা অবলুপ্ত করে দিতে চাইছে। আমেরিকা নাকি সেখানে টুরিস্ট সেন্টার করবে! ওখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করার পরেও যারা বেঁচে থাকবে, তাদের অন্য দেশে তাড়িয়ে দিয়ে ওখানে বিনোদন কেন্দ্র খুলবে। সরাসরি এটা তারা ঘোষণা করেছে। একটা দেশও কি এর প্রতিবাদ করছে?

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা

যদি আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকত, সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকত, এই আক্রমণের প্রতিবাদ করত। ১৯৫৬ সালের ঘটনা বলছি। তখনও মহান স্ট্যালিনের প্রভাব সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অবলুপ্ত হয়নি। সুয়েজ খালের মালিক ছিল ফরাসি এবং ব্রিটিশ কোম্পানি। মিশর সরকার সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করল। ফলে ফরাসি এবং ব্রিটিশ সরকার একত্রে মিশর আক্রমণ করল, বোমা ফেলতে শুরু করল। এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন হুঁশিয়ারি দিল, ১২ ঘণ্টা সময় দিলাম— হয় এই আক্রমণ বন্ধ করো, না হলে আমরা লন্ডন এবং প্যারিসে বোমা ফেলব। লন্ডন-প্যারিসের জনগণকে তারা বলল, তোমাদের সাথে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। কিন্তু তোমাদের সরকার মিশর আক্রমণ করেছে। তোমরা সরকারের কাছে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানাও। ১২ ঘণ্টা লাগেনি, ৬ ঘণ্টার মধ্যে দুই শক্তি মিশর ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ আর নেই। সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে সেখানে শাসন করছে রুশ সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া আজও ইউক্রেনে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের নানা জায়গায় একাধিক আঞ্চলিক যুদ্ধ চলছে। এই সমস্ত আঞ্চলিক যুদ্ধে বিশ্বের বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুক্ত। এগুলি তাদেরই মদতে চলা যুদ্ধ (প্রক্সি-ওয়ার)। তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই এইসব যুদ্ধ চলছে।

বাণিজ্যিক যুদ্ধ চলছে

আর এক রকম যুদ্ধও হচ্ছে, সেটা হল বাণিজ্যিক যুদ্ধ। আপনারা সবাই দেখেছেন শুল্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকি। আমেরিকার অর্থনীতি টলমল করছে। বাজার নেই। কে কার বাজার দখলে রাখবে, কে কার বাজারে ঢুকবে, এই নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ চলছে। প্রত্যেকেই চায় আমার বাজার অটুট থাকুক, আর অন্যের বাজারে আমি ঢুকব। পুঁজিবাদী বাজারের এই সঙ্কট পৃথিবীব্যাপী। কেন এই বাজার সঙ্কট? মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। কেন মানুষ কিনতে পারছে না? দুনিয়া জুড়ে কোটি কোটি বেকার, ছাঁটাই হয়ে যাওয়া শ্রমিক। বিরাট সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারীর আয় খুবই কম। তাদের ব্যয় করার ক্ষমতা নেই, কিনবে কোথা থেকে? এই পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিই তার বাজারকে ধ্বংস করেছে। আর সেই সঙ্কুচিত বাজারে আজ টিকে থাকার লড়াই চলছে। একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, অন্য দিকে তার প্রতিপক্ষ চিনের সাম্রাজ্যবাদ। চলছে দুই পক্ষের লড়াই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন সবাইকে হুমকি দিচ্ছে দর কষাকষি করতে। দেখছে এতে কোথায় কতটা সুযোগ মেলে। ভারতকেও বলছে— শুল্ক কমাও, না হলে আমি পাল্টা চড়া শুল্ক বসাব। শুল্ক কমালে মার্কিন পণ্য এ দেশের বাজারকে গ্রাস করবে। ফলে একদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিরা নরেন্দ্র মোদি সরকারের সাহায্যে ট্রাম্পের সাথে কথা চালাচ্ছে, অন্য দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের কথাবার্তা চলছে। ট্রাম্পের চেষ্টা চিনকে কতটা কোণঠাসা করা যায়। চিন আবার চেষ্টা করছে আমেরিকাকে কতটা কোণঠাসা করা যায়। এই বাণিজ্যিক যুদ্ধ আজ চলছে। সাম্রাজ্যবাদ বাজার নিয়ে লড়াই করে। শোষণের ক্ষেত্র তার চাই। বাজার দখলের যুদ্ধ থেকেই সংঘটিত হয়েছিল প্রথম এবং দ্বিতীয়

সাতের পাতায় দেখুন

সন্তানহারা মায়ের কাছে ক্ষমা চান

একের পাতার পর

নবীকরণ হওয়ারই কথা নয়। তবু রমরমিয়ে ব্যবসা চালাতে হোটেল মালিকের কোনও অসুবিধা হয়নি। জানা গেছে গোটা বাড়িতে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা কার্যত কিছুই ছিল না। ফলে ফায়ার অ্যালার্মের কোনও প্রশ্নই নেই। ছাদে বেআইনি নির্মাণ, দ্বিতীয় সিঁড়ি শাটার দিয়ে বন্ধ রাখা ইত্যাদির বিষয়েও পুরসভা চোখ বুজে ছিল।

আর পুলিশ! তাদের খুশি রাখার মন্ত্র জানেন না এমন ব্যবসায়ী দুর্লভ বললেও কম বলা হবে। স্থানীয় থানায় প্রণামী না পৌঁছলে এমন অনিয়ম তো অসম্ভব। সে প্রণামীর ভাগ স্তরে স্তরে থাকায় থানাও এ নিয়ে নিশ্চিন্ত। প্রায় ১০০ আবাসিক থাকার মতো একটা হোটেল, প্রত্যন্ত কোনও এলাকাতেও নয়, একেবারে বড়বাজারের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তার অবস্থান। সেখানে পুলিশ, পুরসভা এবং দমকলের সবচেয়ে বেশি নজরদারি থাকার কথা। যে কোনও দুর্ঘটনা কী ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে, তা না বোঝার মতো অবুঝ সরকারি কর্তারা নন নিশ্চয়ই! আসলে দমকল কর্তা, পুলিশ, কাউন্সিলর, মন্ত্রী ইত্যাদিদের নজর অবশ্যই ছিল— তা বিশেষভাবের ছিল 'নগদ নারায়ণ'-এর প্রতি। এ দিকে গভীর নজর না থাকলে তাঁরা কি সমস্ত গাফিলতি মেনে নিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বুজে চলতে পারতেন! সমালোচনা হতেই পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র বলেছেন, এ সব যখন তৈরি হয়েছে তখন সমালোচকরা প্রশ্নগুলি তোলেননি কেন? অপূর্ব যুক্তিধারা সন্দেহ নেই! প্রশ্নগুলো কি এখন উঠল? স্টিফেন কোর্ট, আমরি হাসপাতাল, একাধিক বাজারে আগুন এই সমস্ত ঘটনার পরে বারবার নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুরমন্ত্রী কি বলতে চাইছেন যে, তাঁর পরিচালিত পুরসভার অপদার্থতার জন্য তিনি নন, সমালোচকরাই দায়ী!

মুখ্যমন্ত্রী বড়বাজারের দগ্ধ হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে যথারীতি 'রাফ অ্যান্ড টাফ' ধরনের কিছু উত্তেজক মন্তব্য করেই নাকি পার্ক স্ট্রিটে একটি রেস্টুরেন্টে পঞ্চাশটি গ্যাস সিলিন্ডার মজুত থাকা ও সরু সিঁড়ির বিষয়টা ধরে ফেলেছেন! তিনি নাকি নির্দিষ্ট খবর নিয়েই গিয়েছিলেন! দেখা যায় প্রাণহানি, দুর্ঘটনা ঘটার পরেই এই ধরনের খবরগুলো কিছুদিনের জন্য সরকারি কর্তা ও নেতামন্ত্রীরা পেয়ে যান! কিন্তু তাঁদের এই 'খবর পাওয়া'-র সোর্স কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে উবে যায় কী করে? এখন নানা নির্দেশ জারি হচ্ছে, হোটেল মালিকরা জানেন এই ডামাডোলে একটু চুপ করে থাকাই মঙ্গল। কিছুদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার একটা আগুন লাগার ঘটনার আগে যা চলছিল তাই চলবে। আর দমকল? দমকলের কর্তাদের ইনস্পেকশন নিয়ে কথাই চালু আছে, সব কিছু ঠিক থাকলেই তাঁরা বেশি রুষ্ট হন! কারণটা সকলের জানা।

কলকাতার যত্রতত্র শপিং মল, হোটেল, নানা নামের বাজার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। এর যে কোনওটিরই সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন আছে। অগ্নি সুরক্ষা, অন্যান্য দুর্ঘটনা রোধে আগাম সুরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কোনও রকম খরচ করতে মালিকরা অনিচ্ছুক। সর্বোচ্চ লাভ অটুট রাখতে গিয়ে তাঁরা মানুষের জীবনের কোনও তোয়াক্কা করছেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বটে, আমাকে ভোট দিতে হবে না, নিয়ম মানুন, কিন্তু কোনও নিয়ম না মানার এই সাহস মালিকরা পাচ্ছে কোথা থেকে? শাসকদলের মদত ছাড়া কি তা সম্ভব? অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার একাধিক বাজার, কারখানা, গুদাম ইত্যাদিতে আগুন লাগার ঘটনা এই কথাকেই প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শাসকদল এবং দমকল-পুলিশ-পুরসভার কর্তাদের সঙ্গে মুনাফালোভী ব্যবসায়ী চক্রের আঁতাত মানুষের জীবনে বিপদ ডেকে আনছে।

মুনাফালোভী মালিকের কাছে মুনাফাটাই একমাত্র বিচার্য। মানুষের প্রাণ সেখানে পিছনের সারিতে। একই ভূমিকা নেয় শাসকদলগুলো এই মালিকি ব্যবস্থার ম্যানেজার হিসাবে তারা যে যেখানে ক্ষমতায় থাকে সেখানে তারা মালিকদের বাড়তি লাভের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজেদের পকেট ভরাতে ব্যস্ত থাকে। সে কারণেই এরা যখন বিরোধী আসনে থাকে তখন এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে আসরে নামে বাজার গরম করে নিজেদের মুখগুলো জনমানসে নতুন করে ভাসিয়ে তুলতে। বলে, ওদের বদলে আমাদের গদিতে বসান— সব ঠিক করে দেব। সরকারে বসলেই তারা যে একই ভূমিকা নেয় তা মানুষের জানা। সেই কারণে গুজরাটে, দিল্লিতে, মধ্যপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে বেআইনি বাড়ি ভেঙে পড়লে, হাসপাতালে, বাজারে আগুন লেগে মানুষের মৃত্যু ঘটলে বিজেপি নেতাদের ভূমিকা হয় এ রাজ্যের শাসকদের মতোই। আবার তাদেরই ঠিক উল্টো ভূমিকায় এখন দেখা যাচ্ছে বড়বাজারের দগ্ধ হোটেলের সামনে টিভি ক্যামেরায় গলা ফাটানোর কাজে। মালিকের মুনাফার লোভ আর গদিলোভী রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের আখের গোছানোর তাগিদে সাধারণ মানুষের জীবন ঝুলছে একটা সরু সুতোর মধ্যে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সচেতনতা যেমন জরুরি, তেমনই সরকারকে বেআইনি কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াতে বাধ্য করাতে পারে একমাত্র সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ ও আন্দোলন।

বড়বাজারের হোটেলে মর্মান্তিক মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি না চাইলে শাসকদের এই বাধ্য করার কাজে সক্রিয় হতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

কাশ্মীর গণহত্যায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসীদের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং তাকে অজুহাত করে জনজীবনের সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ২৯ এপ্রিল রাজ্য জুড়ে দলের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

বাঁকুড়া ঃ এ দিন বাঁকুড়া শহরে মিছিল ও পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল।

জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি শহরে সম্প্রীতি মিছিল হয় এসইউসিআই(সি)-র উদ্যোগে। জলপাইগুড়ি শহরের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ঘোষ, জেলা কমিটির সদস্য ও জলপাইগুড়ি শহর ১-লোকাল ও ২-লোকালের সম্পাদক কমরেডস সুজয় লোধ, মনোতোষ প্রামাণিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটে সম্প্রীতি মিছিল

সমাজতন্ত্রই পারে মুক্তি দিতে

ছয়ের পাতার পর

মহাযুদ্ধ। আজকের এই বাণিজ্যযুদ্ধ কোন দিকে যাবে, আগামী দিনই তার উত্তর দেবে। এই লড়াইয়ে বিশ্ব আজ চরম সঙ্কটের মুখে।

পুঁজিবাদ জলবায়ুকেও বিপন্ন করছে

আর একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ মানবজাতির উপর নেমে এসেছে। এই যে এত উত্তাপ, যার মধ্যে আপনারা ছটফট করছেন, গ্রীষ্মের এত উত্তাপ কিছু বছর আগেও কি আপনারা দেখেছেন? আগামী বছর তাপমাত্রা আরও বাড়বে। এ-ও পুঁজিবাদের একটা আক্রমণ। তারা উৎপাদন খরচ কম রাখতে গিয়ে পরিবেশের তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ গ্রিন হাউস গ্যাস বাতাসে ছাড়ছে। কারখানার জন্য পেট্রল-ডিজেল-কয়লা ব্যবহার করছে। কিন্তু তা কমানোর জন্য বিজ্ঞানসম্মত পথ নিতে গেলে উৎপাদন খরচ বাড়বে। ফলে তারা তা করবে না। এর ফলে যথেচ্ছ ভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস তারা বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে, যা পরিমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে। বনাঞ্চলও ধ্বংস করছে। বিজ্ঞানীরা বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। প্রায়ই কাগজে বেরোয়, হিমালয়ে আগে যা বরফ জমত, এখন তার থেকে কম জমছে। ফলে হিমবাহ কমছে। নদীর জল আসে হিমবাহ থেকে, তা কমলে নদীর জলও কমবে। ও দিকে মেরু অঞ্চলে বরফ গলে যাচ্ছে। সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়ছে, সমুদ্র স্থলভাগকে আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা বাড়ায় যখন তখন ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন হচ্ছে। কখনও বন্যা কখনও খরায় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। এটা গোটা মানবজাতির উপরে আক্রমণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ গোটা মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করছে। তারা শুধু আজকের মুনাফাই দেখছে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এই পুঁজিবাদ চূড়ান্ত অমানবিক।

নৈতিকতা ধ্বংস করছে পুঁজিবাদ

আর একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণও চলছে। সেটা হচ্ছে— মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে দাও, চরিত্র ধ্বংস করে দাও, মানুষকে অমানুষ করো। সমাজে, মানুষের জীবনে মূল্যবোধ, ন্যায়নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ যেন না থাকে। যেন তারা যুক্তি করতে না পারে, প্রতিবাদ করতে না পারে। এই শাসকরা কী শেখাচ্ছে? মদ খাও, গাঁজা খাও, ড্রাগ খাও, নেশা করে বুঁদ হয়ে থাকো! নোংরা সিনেমা, ব্লু-ফিল্ম, নগ্ন নারীদেহ নিয়ে আলোচনায় মত্ত থাকো! সংবাদপত্রে বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিং-দের নিয়ে লেখা থাকে না। এঁদের জন্মদিন-মৃত্যুদিনের খোঁজ কে রাখে? খবরের কাগজে পাবেন ফিল্মস্টাররা কে কার সাথে প্রেম করছে, ক্রিকেট প্লেয়াররা কে কার সাথে প্রেম করছে, কার সাথে কার বিচ্ছেদ, এই সব। এগুলির মধ্যেই যুব সম্প্রদায়কে মাতিয়ে রাখছে। এই মুহূর্তে কত মেয়ে আর্তনাদ করছে, ধর্ষিত হচ্ছে, খুন হচ্ছে। ছয় মাসের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধা মহিলাও রেহাই পাচ্ছেন না। বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে, শিক্ষক ছাত্রীকে ধর্ষণ করছে, ভাই বোনকে ধর্ষণ করছে— এগুলি ভাবতে পারেন? এ কোন সভ্যতা! বর্বর যুগেও তো এইসব হয়নি। কোনও শিশু তো ধর্ষক হয়ে জন্মায় না। পুঁজিবাদই এই ধর্ষকদের সৃষ্টি করছে। সেক্স লাইফকেই যুবকদের কাছে জীবনের মূল লক্ষ্য তৈরি করছে। এ সব তো পুঁজিবাদই এনেছে। ফলে আমাদের ভাবতে হবে— এই সর্বাত্মক ধ্বংসকারী পুঁজিবাদ টিকে থাকলে মূল্যবৃদ্ধি বাড়বে, বেকারি বাড়বে, ছাঁটাই বাড়বে, অনাহারে মৃত্যু বাড়বে, শিশুমৃত্যু বাড়বে। পুঁজিবাদ থাকলে সন্তান বৃদ্ধ বাবা-মাকে পথে নামিয়ে দেবে, সম্পত্তির লোভে তাঁদের খুন করে দেবে, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেবে। বিবাহিত জীবনে শান্তি থাকবে না। পুঁজিবাদ থাকলে ধর্ষণ বাড়বেই। এর থেকে আমরা মুক্তি চাই কি?

সমাজতন্ত্রই মুক্তি দিতে পারে

এর থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সমাজতন্ত্র এনেছিল নতুন সভ্যতা। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে যে সভ্যতাকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। বলেছিলেন, আশা এবং শান্তির এমন কোনও জায়গা এর আগে আমি খুঁজে পাইনি। বলেছেন, এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সভ্যতার বুকের পাঁজর থেকে লোভকে উৎখাত করছে। এই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, রমাঁ রলাঁ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র বসু। ভগৎ সিং তো নিজেকে কমিউনিস্ট হিসাবে ঘোষণাই করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, আজ বিশ্বে দুটি স্রোত— সাম্রাজ্যবাদ আর কমিউনিজম। ফ্যাসিবাদের পরাজয় মানেই হচ্ছে কমিউনিজমের বিজয়। এ ভাবেই তাঁরা সমাজতন্ত্রকে দেখেছিলেন। এই সমাজতন্ত্র এনেছিল এমন এক সমাজ, যেখানে বেকারত্বের হাহাকার ছিল না, অনাহারে মৃত্যু ছিল না, প্রত্যেকে কাজ পেত, স্বল্পমূল্যে বাসস্থান, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যেত, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল, জ্বালানি দিত রাষ্ট্র। ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত শিক্ষা মিলত বিনামূল্যে। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যেত। রাষ্ট্রই ব্যবস্থা করেছিল, প্রত্যেক শ্রমিক ছুটি পাবে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য, তারা সমুদ্রের ধারে স্বাস্থ্যনিবাসে কাটাবে। সেখানে সংবিধান কে রচনা করেছে? জনগণ। কোনও পণ্ডিত নয়। একেবারে গ্রাম থেকেও শ্রমিক এবং কৃষক প্রতিনিধিরা যাতে একেবারে শীর্ষ সোভিয়েতে আসতে পারে তার গ্যারান্টি ছিল। সুপ্রিম সোভিয়েতে শ্রমিক-কৃষকের কোটাই ছিল সর্বাধিক। প্রত্যেক কিশোরের খেলাধূলা, পড়াশোনার ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করত। যার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘদিন অলিম্পিকে অসাধারণ ফল করত। বিজ্ঞান চর্চায় ১৬ জন সোভিয়েত বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এত দূর এগিয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সমাজতন্ত্রের আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কিছু জাতির আদিবাসীদের ভাষার লিখিত অক্ষর ছিল না। সোভিয়েত নেতৃত্বের উদ্যোগে ভাষাবিজ্ঞানীরা অক্ষর সৃষ্টি করে তাদের মাতৃভাষা বিকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রত্যেকের আলাদা সংবিধান ছিল। আলাদা পতাকা ছিল। প্রত্যেকে চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারত, সেই অধিকার তাদের দিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ যে প্রতিনিধিদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করত, তারা কাজ না করলে তাদের যে কোনও সময় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা ছিল। পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হত না। এই যে ব্যবস্থা, একে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তপোভূমি। তিনি তো কমিউনিস্ট ছিলেন না, মানবতাবাদী ছিলেন। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেছিল, তোমরা অস্ত্র ধ্বংস কর, আমরাও সব অস্ত্র ধ্বংস করব। অস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নেই। যুদ্ধের কোনও প্রয়োজন নেই। এই ছিল সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা। একে ধ্বংস করেছিল বাইরের সাম্রাজ্যবাদ আর কিছু ত্রুটির সুযোগ নিয়ে ভিতরের পরাজিত পুঁজিবাদ। ফলে মনীষী রমাঁ রলাঁর ভাষায়— সমাজতন্ত্র ধ্বংস হলে রাশিয়ার শ্রমিকরাই শুধু ক্রীতদাস হবে না, বিশ্বে নেমে আসবে অন্ধকার। আজ তাই ঘটেছে।

হয় মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী এই পুঁজিবাদ, পচাগলা, জরাগ্রস্ত পুঁজিবাদ থাকবে, আর না হয় একে উচ্ছেদ করে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস

প্রখর তাপ দমাতে পারেনি ভাষণ শোনার আগ্রহকে। শহিদ মিনার, ২৪ এপ্রিল

ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে আবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই দুটি পথ আছে। আমরা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সেই লক্ষ্যেই এই দল পরিচালনা করছি। আমরা শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম সংগঠিত করছি। আমরা গরিব কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষদের সংগ্রাম সংগঠিত করছি।

জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে

এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। এ কথা ঠিক যে, ভোটসর্বস্ব দলগুলির ক্ষমতালোভী নেতারা ঠকায়। কিন্তু ওই নেতারা ঠকাতে পারছে কেন? আপনারা ঠকছেন কেন? কারণ, আপনারা রাজনীতি বুঝতে চান না। রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চান না। কিন্তু রাজনীতিই তো আপনাদের জীবন চালাচ্ছে! আপনাদের ঘরে নুন, তেল কেনা থেকে সন্তানের পড়াশোনা, চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে রাজনীতি নেই। মেয়ের বিয়ে দিতে হলেও রাজনীতি আছে। আপনারা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সরকারি সিদ্ধান্ত, আইন-কানুন মানছেন, নির্বাচনে কোনও একটি দলকে ভোট দিচ্ছেন। এ সব তো রাজনীতিই করা। আপনারা প্রচলিত রাজনীতিকে না বুঝেই সমর্থন করছেন, শক্তিশালী করছেন। অথচ ভাবছেন, আমরা রাজনীতির মধ্যে নেই। এটা নিজেকেই ঠকানো। রাজনীতি আপনাকে চালাচ্ছে, অথচ আপনি রাজনীতি বুঝবেন না! এর ফলে কী হচ্ছে? পুঁজিবাদী শাসকদের সেবাদাস দলগুলি আপনাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে। এক একটা দল মুখোশ পরে দাঁড়ায়, নানা বুলি আওড়ায়। খবরের কাগজে, টিভিতে বিরাট প্রচার পায়। আপনারা তার পিছনে ছোটেন। তার পরে মার খান। তাই আমরা চাই, আপনারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাজনীতি বুঝুন। প্রত্যেকটি দলকে বিচার করে দেখুন, সেই দল যথার্থ গরিবের দল কি না। দু'টি রাজনীতি— একটা পুঁজিবাদকে রক্ষা করার রাজনীতি, দলের নাম, পতাকার রঙ তার যাই হোক। আরেকটা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার, শ্রমিক বিপ্লব করার রাজনীতি, যে রাজনীতি নিয়ে আমরা চলছি। আমরাও ঠিক পথে চলছি কি না, আমাদেরও যে সঠিক পথে চলার দাবি, তা ঠিক কি না, এটাও আপনারা বিচার করবেন। কিন্তু কী করে বিচার করবেন, যদি রাজনীতির চর্চা না করেন? ভারতবর্ষে একমাত্র আমাদের দল বারবার জোর দিচ্ছে যে, জনগণ রাজনীতির চর্চা করুন। আমাদের দল চাইছে জনগণ নিজেরা এলাকায় এলাকায় কৃষকদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে গণকমিটি গড়ে তুলুক। এই কমিটিই ঠিক করবে কাকে ভোট দেবে, কাকে দেবে না। এই কমিটিই ঠিক করবে কোন দাবি নিয়ে আন্দোলন করবে, কোন পথে আন্দোলন করবে।

আর জি কর আন্দোলন সম্পর্কে

আমরা চেয়েছিলাম, আর জি কর আন্দোলন এই ভাবেই চলুক। আমাদের দল সামনে আসেনি। আমরা পিছন থেকে সাহায্য করেছি। এটা ঘটুক আমরা চেয়েছি। অনেকের মধ্যে একটা হতাশা আছে— আর জি করে এত কিছু করে কী হল? কিন্তু আমি বলি, কিছুই কি হয়নি? যদি আন্দোলন না হত, এত বড় একটা ষড়যন্ত্র যে হয়েছে, তা বোঝা যেত কি? কর্তৃপক্ষ-পুলিশ-প্রশাসন তো আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিয়েছিল। আন্দোলন না হলে আপনারাও মনে করতেন এটা আত্মহত্যা। এটা যে আত্মহত্যা নয়, জানলেন কী করে? প্রতিবাদ হয়েছিল বলেই তো! আন্দোলন হয়েছিল বলেই তো! এই আন্দোলনের ফলেই তো পুলিশ কমিশনারকে সরতে হল। নর্থ ডিসি, সেন্ট্রাল ডিসিকে সরতে হল। কলেজের অধ্যক্ষকে, আরও কয়েকজনকে জেলে যেতে হল। স্বাস্থ্যব্যবস্থার ব্যাপক দুর্নীতি সামনে এল। কয়েকজন স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে সরতে হল। আংশিক হলেও তো এগুলি সাফল্য। এই আন্দোলন রাজ্য সরকারের ভূমিকাটাও দেখিয়ে দিল। কী ভাবে তারা একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে পারে, প্রমাণ লোপাট করতে পারে! এ রাজ্যে সকলেই মনে করে আর জি কর হত্যাকাণ্ডে প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। এটা মানুষ বুঝেছে আন্দোলনের জন্যই। আবার এটাও প্রমাণিত যে, কেন্দ্রীয় সরকার তার স্বার্থে এমন ভাবে সিবিআইকে চালনা করেছে, যাতে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত না হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারও এই আন্দোলনে ভীত হয়ে পড়েছিল। গোটা রাজ্যবাসী আন্দোলনে, গোটা ভারতবাসী আন্দোলনে, এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও আন্দোলন। এমন একটা আন্দোলন, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অপমানিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত নারীশক্তি দুর্নিবার নির্ভীকতায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। মাঝরাতে শহরে-গ্রামে হাজারে হাজারে মহিলা প্রতিবাদে রাস্তা দখল করেছে। এমন ঘটনা ভারতবর্ষের স্বদেশি আন্দোলনের যুগেও ঘটেনি। কোনও আন্দোলনে হয়নি। এতে কেন্দ্রীয় সরকার ভীত হয়ে গিয়েছিল। বিজেপি শাসিত রাজ্যেও রোজ ধর্ষণ হচ্ছে, অপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে না।

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 39 Bengali Weekly May 9, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে শক্তিশালী করুন

সাতের পাতার পর

আন্দোলনের প্রভাব তো সেখানে গিয়েও পড়বে। ফলে আন্দোলন যাতে স্তিমিত হয়ে যায় তার জন্য বিজেপি চেষ্টা করেছে, সিবিআইকে ব্যবহার করেছে। যে কারণে প্রথমে বিজেপি হম্বিতম্বি করলেও পরে সরে গেল। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সিবিআইকে ব্যবহার করেছে যাতে প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত না হয়। সিপিএমও চেষ্টা করেছে ভোটের দিকে আন্দোলনকে নিয়ে যাওয়ার। আমরা চেষ্টা করেছি, আমরা সামনে থাকব না, আমরা ব্যাক করব, গণকমিটিই আন্দোলন চালাক, ছাত্ররাই চালাক এবং প্রকৃত দোষীরা ধরা পড়ুক।

সব আন্দোলনই সবসময় দাবি আদায় করতে পারে না। ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন— এত বড় আন্দোলন, কিন্তু দাবি আদায় হয়নি। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে দাবি আদায় হয়নি। নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনী দেশকে মুক্ত করতে পারেনি। ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহে তৎক্ষণাৎ সাফল্য আসেনি। কিন্তু প্রত্যেকটি আন্দোলন, আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রভাব, নৌবিদ্রোহের প্রভাব ক্ষমতা হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করেছে। আসলে আন্দোলন হচ্ছে— এটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। মানুষ অন্যায়-অবিচার মেনে নিচ্ছে না, প্রতিবাদ করেছে, মাথা তুলেছে, সংগ্রাম করেছে— এটাও কম নয়। যত প্রতিবাদ করবে, তত প্রতিবাদের, প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে, আর হতাশায় মাথা নিচু করে অন্যায় মেনে নিলে অত্যাচারী আরও বেপরোয়া অত্যাচার চালাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।' অন্যায় সহ্য করাও একটা অপরাধ। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, 'অন্যায় আর মিথ্যার সাথে আপস করার মতো নিকৃষ্ট অপরাধ আর নেই।' তিনি বলেছেন, ঘরে-বাইরে, স্কুলে-কলেজে, পথে-ঘাটে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করেছি। যতটুকু ক্ষমতা অর্জন করেছি, তার দ্বারাই করেছি। এই শিক্ষাগুলোই তো মূল্যবান শিক্ষা। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, অন্যায়ের যদি প্রতিবাদ করতে না পারো তো তুমি মানুষ নামেরই যোগ্য নয়।

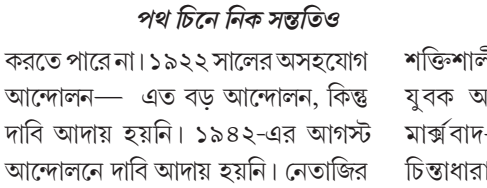

পথ চিনে নিক সন্ততিও

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিন

তাই হতাশার কোনও কারণ নেই। আবার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে হবে। আমি আবারও আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা রাজনীতি বুঝুন, আপনারা যে যেখান থেকে আসছেন জনগণকে বলুন রাজনীতি বোঝ, মানুষ চেনো, দল চেনো। খবরের কাগজ, টিভির প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। নিজে বিচার করুন। একটা টাকার নোট দিলে জাল কি খাঁটি তা তো আপনারা যাচাই করে দেখেন! একটা দলকেও তো দেখতে হয়, বিচার করতে হয়। আর সংগঠিত হতে হবে। এখানে হিন্দু নেই, মুসলিম নেই, কোনও জাত নেই, কোনও ধর্ম-বর্ণ নেই, আছে শুধু শোষক আর শোষিত, পুঁজিপতি এবং শ্রমিক। গোটা সমাজ এই ভাবে বিভক্ত। এই ভাবে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। আপনারা আমাদের দলকে শক্তিশালী করুন, আপনাদের মধ্যে যাঁরা যুবক আছেন তাঁরা এগিয়ে আসুন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ঝান্ডাকে বহন করুন। বৃদ্ধরা আমাদের কর্মীদের পরামর্শ দিন। তাদের উৎসাহ দিন। তারা ভুল করলে সংশোধন করবেন এই দলকে আপন মনে করে।

আর আমি প্রত্যেককে বলব, পাড়ায় পাড়ায় শিশুরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নোংরা আলোচনা করছে নোংরা পরিবেশের প্রভাবে। এদের রক্ষা করুন। এদের নিয়ে রবিবার সকালবেলা খেলাধূলা করান। এদের নিয়ে গান-নাটক করান। এদের বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিং-চন্দ্রশেখর আজাদ-ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন- প্রীতিলতাদের চেনান, এঁদের জীবনকাহিনী দিয়ে এদের উদ্বুদ্ধ করুন, অনুপ্রাণিত করুন। তা না হলে আগামী দিন আরও ভয়ঙ্কর। নিশ্চয় আপনারা তা চান না। আমি আগেই বলেছি, একদিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস, আর একদিকে এর থেকে মুক্তি। ফলে একদিকে পুঁজিবাদ আর একদিকে সমাজতন্ত্র। এর মাঝখানে আর কোনও কিছু নেই।

এই কথা বলেই আপনাদের সকলকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মে দিবস

একের পাতার পর

জমায়েত হয়েছে ওই দিন। পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষ হয়েছে শ্রমিকদের। পুলিশের বীভৎস মারে আহত হয়েছেন বহু শ্রমিক। ফিলিপিন্সের ম্যানিলাতে হাজার হাজার শ্রমিক মিছিল করেছেন। সেখানে নিরাপত্তাবাহিনীর ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেন শ্রমিকরা। পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় মজুরি বৃদ্ধি এবং ঠিকা শ্রমিক ও পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবিতে প্রায় দু'লক্ষ মানুষ মিছিলে পা মেলান। তুরস্কের ইস্তানবুল, আঙ্কারা সহ ৩০টি প্রদেশে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করেছেন কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে। গ্রেফতার হয়েছেন শ্রমিক নেতারা। সর্বত্রই শ্রমিকদের মুখে ছিল পুঁজিবাদবিরোধী স্লোগান, সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ ধ্বনি। সর্বত্র স্থায়ী নিয়োগ এবং স্থায়ী বেতন ও ৮ ঘন্টার বেশি কাজ না করানোর স্লোগান তুলেছেন তারা। প্যারিসের মতোই টোকিও-র মিছিল থেকে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতি রূপায়ণের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছে। স্পেনের বার্সেলোনা, মাদ্রিদ সহ সব বড় শহরে বিরাট বিরাট মিছিল হয়েছে।

জার্মানির বার্লিনে মে দিবসের মিছিল

গ্রিসের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিল হয়েছে। কিউবার রাজধানী হাভানায় পা মিলিয়েছেন প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ। শ্রীলঙ্কার সরকারি বামপন্থীরা এক লক্ষের বেশি মানুষের জমায়েত করেছিল, তেমনই সরকার ও আইএমএফ-বিরোধী ফ্রন্টলাইন সোসালিস্টদের জমায়েতও ছিল বিরাট। বাগদাদেও বিরাট মিছিল হয়েছে মে দিবসে। প্যালেস্টাইন থেকে মে দিবসের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছে মার্ক্সবাদী মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট। লাতিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, চিলি, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনার মতো দেশগুলিতেও হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে নেমেছেন। আমেরিকার শিকাগো, লস এঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন সহ নানা শহরে ৬০০টি-র বেশি বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মে দিবস উপলক্ষে ভারতের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ১০টি শ্রমিক সংগঠনের আহ্বানে রাজ্যে রাজ্যে দিনটি পালিত হয়। কলকাতায় শহিদ মিনার ময়দানে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম কোড, ব্যাপক হারে ছাঁটাই, কর্পোরেট মালিকের তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে ও কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে সোচ্চার ছিল এই সমাবেশ।

কলকাতায় শহিদ মিনারের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড স্বপন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ। আগামী ২০ মে শ্রমিক সংগঠনগুলি সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

দেশে দেশে মিছিল, জমায়েত, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ প্রমাণ করে সব দেশেই গরিব-খেটেখাওয়া মানুষের দুর্দশা আজ কী প্রবল আকার নিয়েছে। এ বারের মে দিবস দেখিয়ে দিল বিশ্বের সর্বত্র তীব্র পুঁজিবাদী সংকটে হাঁসফাঁস করা শ্রমিকরা প্রতিরোধ চাইছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া জনসাধারণ বুঝতে পারছে, লড়াই ছাড়া বাঁচার অন্য কোনও পথ নেই। পুঁজিপতি শ্রেণি শত চেষ্টা করেও এই ব্যবস্থার সংকটকে আর চেপে রাখতে পারছে না। দাবিয়ে রাখতে পারছে না শ্রমিক বিক্ষোভকেও। কিন্তু বিক্ষোভ যতই তীব্র হোক, বারে বারে তা ব্যর্থ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সঠিক নেতৃত্বে এবং সঠিক নীতির বিরুদ্ধে গড়ে উঠবে। আরব বসন্ত, অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আছড়ে পড়েছিল জনসাধারণের বিক্ষোভের ঢেউ। সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হলেও সঠিক পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি। কারণ বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা বদলানোর লক্ষ্য ছাড়া জনগণের বিক্ষোভ যত তীব্র যত বিশাল আকারেই হোক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের জোয়ার এবং সেই আন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের পরিপূরক করে গড়ে তোলা। মনে রাখতে হবে, পুঁজিপতি শ্রেণি তথা মালিক শ্রেণি অত্যন্ত সুসংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণিকে লড়তে হলে সুসংবদ্ধ, সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। না হলে তার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না।

সমাজ জুড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের আকুতি আজ তীব্র, সমাজতন্ত্র কায়েমের প্রয়োজনও উপলব্ধি করছেন শ্রমিকরা। প্রয়োজন সঠিক শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই।

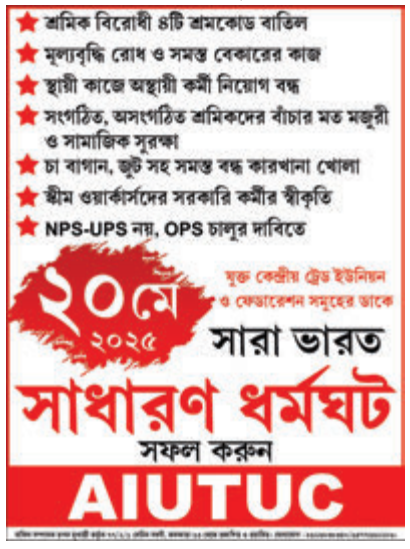

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com